নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

ড. মাহিন খান

জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রনীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৬ নম্বর অভীষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে " নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনঃ পরিকল্পিত পানির উৎস সংরক্ষণ উদ্যোগ ও দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের সকলের জন্য, বিষয় করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা।" এই অভীষ্টটি বাস্তবায়নে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর ও অধিদপ্তর বিশেষ করে তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর,চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এ বিষয় গুলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে নানা ধরনের প্রচার কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করছে। শুধু তাই- না এবিষয়ে জনগণের মতামত ও সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের নিকট যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পৌঁছে দিচ্ছে।

আমরা সবাই জানি জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।দেশ স্বাধীনের সময় দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি,আর বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুনেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে ষোল কোটি অতিক্রম করেছে। ধারণা করা হচ্ছে ২০৫০ সাল নাগাদ এ দেশের জনসংখ্যা ২০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এতে পরিবেশের পরিবর্তনজনিত উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে।জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য নগরায়ন ও শিল্পায়ন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে।এতেকরে পানি,বায়ু ও মাটির দূষণ বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে,যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দিবে।

বর্ধিত হারে শিল্প কলকারখানা স্থাপনের ফলে পানি দূষণ এখন জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকি। পানি দূষণরোধে বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল নিয়ে দায়িত্ব পালন করছে,যা কোনভাবেই যথেষ্ট না।সারা দেশে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান পানি দূষণ করে চলছে তাদের সকলকে পর্যবেক্ষণের আওতায় এনে নিয়মিত মনিটরিং করা পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে এটা প্রয়োজন।এজন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার, পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের পানি দূষণের জন্য মূলতঃ দায়ী শিল্পী কলকারখানার বর্জ্য, নগর এলাকার বর্জ্য, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক বর্জ্য, নৌ যান থেকে চোয়ানো তেল, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও আর্সেনিক। এসব দূষণের বিষয় বছরের পর বছর কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহন না করার কারণে আমাদের নদীগুলোর পানির মান মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশের নদীগুলোর পানি দূষণের মাত্রা শীত কালে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বর্ষা মৌসুমে পানির মান কিছুটা উন্নতি হলেও তা মান সম্মত হয় না। দেশের শিল্পায়ন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও কুমিল্লার মতো গুটিকয়েক এলাকায় সীমাবদ্ধ। সে কারণে এসব এলাকার নদীগুলোর পানি বেশি দূষণের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকার প্রধান দুটি নদী বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ তীরে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প কলকারখানার বর্জ্যের কারণে এ নদী দুটির পানি মারাত্মক দূষণের শিকার হচ্ছে। এ নদী দুটির পানি এখন আর ব্যবহার উপযোগী নয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নর্দমার নোংরা পানি ও নগরীর কঠিন বর্জ্যের চূড়ান্ত গন্তব্যে পরিনত হয় নদী। দেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬০ জেলার এক লাখ ২৬ হাজার ১৩৪ বর্গকিলোমিটার এলাকার খাবার পানি আর্সেনিক দূষণের শিকার। বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে টেকসই উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ায় দেশের পানি নিরাপত্তা খাতে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে। চর,হাওর,পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা পরিসেবা বিরাজমান। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় এ সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রকট।দুর্গম এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করণের জাতীয় কৌশল ২০১১ অনুযায়ী, পাহাড়ি অঞ্চলের পর উপকূলীয় এলাকায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক দুর্গম ইউনিয়ন অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার কারণে উপকূলীয় এলাকা মারাত্মক ভঙ্গুরতার শিকার। ভূগর্ভস্থ পানিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধি এ সব এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বাড়তি দুর্ভোগের কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের দক্ষিণ - পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার প্রায় ২৫ লাখ মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানির চরম সংকটে ভুগছেন। ২০৫০ সাল নাগাদ ঐ অঞ্চলের ৫২ লাখ দরিদ্র ও ৩২ লাখ চরম দারিদ্র্য পানি সংকটের সম্মুখীন হবে।উপকূলীয় অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের এলাকার লবনাক্ত পানি ব্যবহার উপযোগী না হওয়ায় তারা বিভিন্ন অরক্ষিত স্বাধুপানির উৎস যেমন পুকুরের পানি ব্যবহার করে থাকে। এতেকরে ঐ এলাকার জনগোষ্ঠী মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবন এলাকার স্কুল গুলোতে কিশোরী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে। কারণ এ সব কিশোরী শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পরিবারের জন্য নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে হয়।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় উপকূলীয় এলাকার ন্যায় পাহাড়ি এলাকা,হাওর অঞ্চল, চর অঞ্চল ও বস্তিবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সব সময়ই একটা বড়ো চ্যলেঞ্জ।আমাদের দেশের বেশির ভাগ বস্তিই নিচু

ভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় সেখানকার জনগণ জলাবদ্ধতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা পাশাপাশি স্বাধুপানির সংকট ও খাবার পানির সমস্যা বস্তিবাসীসহ চর অঞ্চল, হাওড় অঞ্চল ও পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের জন্য সব সময় একটি বড়ো ইস্যু।এসব এলাকার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি অন্য যেকোনো এলাকার মানুষের থেকে বেশি। এসব এলাকায় পানি বাহিত রোগ বিশেষ করে ডায়রিয়া, আমাশয়ের মতো রোগ এবং ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর মতো মশাবাহিত রোগ বেশি দেখা যায়। দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দুষিত জলাশয় পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রাম ও শহর এলাকার সব মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতিমধ্যেই দেশের শতকরা ৯৮.৩ শতাংশ জনগনকে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরে মানুষের জন্য শতভাগ এবং গ্রামের মানুষের জন্য শতকরা ৯০ শতাংশ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতিমধ্যেই দেশের শতকরা ৮১.৫ শতাংশ মানুষের জন্য স্বাস্থ সম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। এসডিজি'র এ লক্ষ্য মাত্রাটি ২০৩০ এর আগেই বাস্তবায়ন সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

দেশ স্বাধীনের পর থেকেই নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তবে এক যুগ আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়।আজকের বাংলাদেশ সকল সমস্যাকে সফলভাবে সমাধান করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা আপার সম্ভাবনার এক বাংলাদেশ। ২০৪১ এর উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা বাংলাদেশ।

#

০৫.০৪.২০২২ পিআইডি ফিচার